বুখারী বনাম আহলে হাদীস

'বুখারী বনাম আহলে হাদীস' নামে প্রচারিত হ্যান্ডবিলের বিভ্রান্তি দূরীকরণের পূর্বে কিছু কথা জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরী।

১। আহলে হাদীস কোন ব্যক্তি বিশেষের অন্ধানুকরণের জামাআত নয়। কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীস-ভিত্তিক একটি মতাদর্শের নাম, যা ইসলামের মূল স্রোতধারা ও রাজপথ।

২। তার মানে হাদীস সহীহ হলে সেটাই আহলে হাদীসের মযহাব হয়। যেমন সকল মুহাদ্দিসীন ও আয়েম্মায়ে কিরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ)গণের মযহাব তাই ছিল। তাঁরা সকলেই আহলে হাদীস ছিলেন।

৩। এতদ্‌সত্ত্বেও মতভেদের কারণ কী? কারণ পরস্পর-বিরোধী বর্ণিত হাদীস।

আহলে হাদীস তাহকীক ক'রে যে হাদীসটি সহীহ পর্যায়ের, কেবল সেই হাদীসটির উপর আমল করে এবং দুর্বল হাদীস বর্জন করে।

পরস্পর-বিরোধী উভয় হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে নাসেখ-মনসূখ নির্ণয় করে। তা সম্ভব না হলে উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন ক'রে আমল করার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মাসআলাই তাদের মযহাব হয়। তারা কোন নির্ধারিত ব্যক্তির অন্ধানুকরণ ক'রে তারই মযহাবকে (সবার চেয়ে সঠিক) প্রমাণ করার মানসে যয়ীফ হাদীসকে সহীহ করার পাঁয়তারা করে না অথবা কোন সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা বা তাবীল করে না।

সবচেয়ে বেশি শুদ্ধ ও সহীহ হাদীসগ্রন্থ বুখারী। তাবলে তা আহলে হাদীসের একমাত্র হাদীসগ্রন্থ নয়। বরং অন্য গ্রন্থের হাদীস সহীহ সনদে পেলে তা গ্রহণ করে এবং বুখারীতে তার বিপরীত থাকলে পরস্পর-বিরোধী হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন ক'রে আমল করে।

হাদীসটির সনদ সহীহ, নাকি যয়ীফ---তা নিয়ে মতভেদ থাকার ফলে যেমন ইসলামে বিভিন্ন মযহাব সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আহলে হাদীস উলামাগণের মাঝেও একই মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন মত বর্তমান থাকা অস্বাভাবিক নয়। যেমন একই মযহাবের ভিতরে একাধিক মত বা বিভিন্ন উপ-মযহাব সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সুতরাং মতভেদ থাকতে পারে, থাকবে। কিন্তু তা নিয়ে কলহ-দ্বন্দ্ব বা কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করা মোটেই উচিত নয়।

উদার মানুষ যেটাকে সবচেয়ে সঠিক বলে বিশ্বাস করবে, সেটার অনুসরণ করবে এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের অন্ধানুকরণ করবে না। এটাই তো হিদায়াতের পথ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ}

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাগণকে -- যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭- ১৮ আয়াত)*

এই মুখবন্ধের পর চলুন এবার কাসেমী সাহেবের প্রচারিত 'বুখারী শরীফ বনাম আহলে হাদীস' লিফলেটে উল্লিখিত বিভ্রান্তিমূলক পরস্পর বিরোধী মাসআলাসমূহের সত্যতা যাচাই করি। তারপর বিচার করবেন উদার পাঠক। আহলে হাদীস কী কারণে বুখারীর বিপরীত মত গ্রহণ করেছে?

বুখারী শরীফ	আহলে হাদীস
১। রাসূলুল্লাহ সাঃ পেশাব-পায়খানা করার সময় কেবলার দিকে মুখ করে অথবা পিঠ করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ২৬ পৃঃ ১৪৪ নং হাদীস)*	পেশাব-পায়খানা করার সময় কেবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করতে কোন অসুবিধা নাই। *(নুযুলুল আবরার ১ খন্ড ৫৩ পৃঃ, লেখক আল্লামা অহীদুযযামান সাহেব হায়দারা বাদী)*

পাঠক নিশ্চয় ধারণা পেয়ে থাকবেন, আহলে হাদীস বুখারী শরীফের বিরোধী। চলুন দেখি, এ দাবী সত্য কি না।

বুখারী শরীফের তিন জায়গায় (১৪৫, ১৪৮ ও ৩১০২নং) একটি হাদীস রয়েছে, যাতে আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেছেন, একবার বাড়ির ছাদে উঠে দেখি নবী ﷺ কিবলার দিকে পিঠ ক'রে নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছেন।

তাহলে কাসেমী সাহেবের খেলানো খেলাটা 'বুখারী বনাম আহলে হাদীস'এর হল নাকি 'বুখারী বনাম বুখারী'র?

ইমাম বুখারী কাসেমী সাহেবের উদ্ধৃত হাদীসের শিরোনামে বলেছেন,

بَاب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

বাব ঃ প্রস্রাব-পায়খানা করার ক্ষেত্রে কিবলাকে সামনে করা যাবে না। তবে দেওয়াল ইত্যাদির ইমারতে হলে ভিন্ন কথা।

এই জন্য কেবল আহলে হাদীসই নয়, বরং অনেক মযহাবীও বলেছেন, টয়লেটের ভিতরে হলে প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে করাতে দোষ নেই। সেটাই হয়তো অহীদুয যামান সাহেব লিখেছেন। আরো অভিমত জানতে আহলে হাদীস আলেম আব্দুল হামীদ মাদানী কর্তৃক প্রণীত পুস্তক 'ইসলামী জীবনধারা' পড়তে পারেন।

বুখারী শরীফ	আহলে হাদীস
২। রাসূল সাঃ নামায পড়া অবস্থায় কেবলার দিকে শয়নরত আম্মাজান আয়েশা রাঃ-র পায়ে হাত দিয়ে ঠোকর মেরেছেন। নামাযও ভাঙ্গে নাই, ওজুও ভাঙ্গে নাই। *(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ৫৬ পৃঃ, ৩৮২ নং হাদীস)*	ওজু অবস্থায় কোন মহিলার শরীর স্পর্শ করলে ওযু ভেঙ্গে যায়। *(তাইসীরুলবারী ১ম খন্ড ১৪২ নং হাদীস, লেখক আল্লামা অহীদুজ্জামান সাহেব হায়দারা বাদী)*

এ মাসআলাও কেবল 'বুখারী বনাম আহলে হাদীস'এর নয়। বরং চার মযহাবের অনেক মযহাবীও রয়েছেন অহীদুয যামান সাহেবের সাথে। আর কাসেমী সাহেবরাই দাবী করেন, চার মযহাবই বরহক। তাছাড়া হাদীসে তার দলীলও রয়েছে। তবে আহলে হাদীসদের কাছে তা সহীহ নয়। (দেখুন ঃ সিঃ যয়ীফাহ ১০০০নং)

সুতরাং আহলে হাদীসের মত জানতে 'স্বালাতে মুবাশ্‌শির' পড়তে পারেন। সেখানে বলা হয়েছে,

নারীদেহ স্পর্শ করলে ওযু ভাঙ্গে না। কারণ, মহানবী ﷺ রাত্রে নামায পড়তেন, আর মা আয়েশা (রাঃ) তাঁর সম্মুখে পা মেলে শুয়ে থাকতেন। যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন তাঁর পায়ে স্পর্শ করে পা সরিয়ে নিতে বলতেন। এতে তিনি নিজের পা দু'টিকে গুটিয়ে নিতেন। *(বুঃ ৫১৩, মুঃ ৫১২নং)*

তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে চুম্বন দিতেন। তারপর ওযু না করে নামায পড়তে বেরিয়ে যেতেন। *(আদাঃ ১৭৮-১৭৯ নং, আঃ ৬/২১০, দিঃ ৮৬, নাঃ ১৭০, ইমাঃ ৫০২নং, দারাঃ ১/১৩৮, বাঃ ১/১২৫)*

বুখারী শরীফ	আহলে হাদীস
রাসূল সাঃ নামায পড়া অবস্থায় আম্মাজান আয়েশা রাঃ কেবলার দিকে শুয়ে থাকতেন। প্রয়োজনে কেবলার দিক থেকে উঠে চলে যেতেন। নামায বাতিল হত না। *(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ৭৩ পৃঃ, ৫১১ নং হাদীস)*	নামাযী ব্যক্তির সামনে দিকে সাবালিকা মেয়ে পার হয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যায়। *(স্বালাতে মুবাশশির ৭৭ পৃঃ, লেখক আব্দু হামীদ ফাইযী)*

কাসেমী সাহেবের খেলানো এ খেলাটাও চালে ঠিক হয়নি। কারণ, আম্মাজান আয়েশা নামাযরত নবী ﷺ-এর স্ত্রী এবং তিনি শুয়ে থাকতেন। অতঃপর প্রয়োজনে লেপের নিচে থেকে বের হয়ে যেতেন। তাঁর সামনে বেয়ে পার হতেন না।

পক্ষান্তরে কোন নামাযরত সুতরাবিহীন নামাযীর সামনে বেয়ে সাবালিকা যুবতী যদি পার হয়ে যায়, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়। এ কথা আহলে হাদীসের নয়, বরং হাদীসের।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "(সুতরাহ না হলে) সাবালিকা মেয়ে, গাধা ও কালো কুকুর নামায নষ্ট করে ফেলে।" আবূ যার্র বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! হলুদ ও লাল না হয়ে কালো কুকুরেই নামায নষ্ট করে তার

কারণ কি?' বললেন, "কারণ, কালো কুকুর শয়তান।" *(মুসলিম ১১৬৫, আবূ দাউদ ৭০২, তিরমিযী ৩৩৮, নাসাঈ ৭৫০, ইবনে মাজাহ ৯৪৯নং)*

বুখারী শরীফ	আহলে হাদীস
৪-খন্দকের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাঃ মাগরিবের সময়ে আসরের নামায কাযা পড়েছিলেন। ভুলবশতঃ কখনও নামায ছেড়ে গেলে কাযা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। *(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ৮৩-৮৪ পৃঃ, ৫৯৬-৫৯৭ নং হাদীস)*	ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিলেও কাযা পড়া প্রয়োজন নাই। তওবা ও ইস্তেগফার করাই যথেষ্ট। *(দস্তরুল মুত্তাকী ১৪৯ পৃঃ লেখক মাওলানা মুহাঃ ইউনুস দেহলবী)*

এ খেলাতেও কাসেমী সাহেবের চালে ভুল হয়ে গেছে। কারণ, নবী ﷺ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেননি। আর 'ভুলবশতঃ কখনও নামায ছেড়ে গেলে কাযা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

পক্ষান্তরে আহলে হাদীস যেটা বলেছে, সেটা হল, 'ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিলে কাযা পড়া প্রয়োজন নাই। তওবা ও ইস্তেগফার করাই যথেষ্ট।'

বিস্তারিত দেখুন ঃ স্বালাতে মুবাশ্‌শির, বিভ্রান্তির অপনোদন হবে। সেখানে বলা হয়েছে,

বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দিলে বা সুযোগ ও সময় থাকা সত্ত্বেও না পড়ে অন্য অক্ত্ এসে গেলে পাপ তো হবেই; পরন্তু সে নামাযের আর কাযা নেই। পড়লেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। বিনা ওজরে যথাসময়ে নামায না পড়ে অন্য সময়ে কাযা পড়ায় কোন লাভ নেই। বরং যে ব্যক্তি এমন করে ফেলেছে তার উচিত, বিশুদ্ধচিত্তে তওবা করা এবং তারপর যথাসময়ে নামায পড়ায় যত্নবান হওয়ার সাথে সাথে নফল নামায বেশী বেশী করে পড়া। *(মুহাল্লা, ফিসুঃ ১/২৪১-২৪৩, ফিসুঃ উর্দু ৭৮পৃঃ, ১নং টীকা, মবঃ ৫/৩০৬, ১৫/৭৭, ১৬/১০৫, ২০/১৭৪, মিঃ ৬০৩নং হাদীসের আলবানীর টীকা দ্রঃ)*

বুখারী শরীফ	আহলে হাদীস
৫-রাসুলুল্লাহ সাঃ যেহরী নামাযে 'আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন' থেকে কেরাত শুরু করতেন অর্থাৎ, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নীরবে পড়তেন। *(বুখারী শরীফ ১০৩ পৃঃ, ৭৪৩ নং হাদীস)*	জেহরী নামাযে ইমাম সাহেব 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পড়বেন। *(উরফুল জাদী ৩৬ পৃঃ লেখক নবাব নুরুল হাসান খান)*

এই মাআলায় বুখারীর প্রতিপক্ষে আহলে হাদীস নয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ কাসেমী সাহেব পাশের গ্রামের আহলে হাদীস মসজিদের জেহরী নামায দেখতে পারেন। ইমাম সাহেব কি 'বিসমিল্লাহ' সশব্দে পড়েন? সুতরাং এটা দিয়ে খেলা বেশ জমবে না। স্বপক্ষে-বিপক্ষে হাদীস আছে। তবে সশব্দে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার হাদীসগুলি সহীহ নয়। বিস্তারিত জানতে লেখক আব্দুল হামীদ মাদানীর 'স্বালাতে মুবাশ্‌শির' ও 'বিচ্ছিন্নতার অবসান হোক' বা 'স্বালাতে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান' বই পড়ুন।

বুখারী শরীফ	আহলে হাদীস
৬-ইবনে মাসউদ রাঃ-র সঙ্গে মুসাফা করার সময় রসূলুল্লাহ সাঃ দুই হাত বাড়িয়ে মুসাফা করেছেন। *(বুখারী শরীফ ২ম খন্ড, ৯২৬ পৃঃ, ৬২৬৫ নং হাদীস)*	(ইংরেজদের হ্যান্ডশেক প্রথার অনুকরনাযুযায়ী) মুসাফা এক হাতে করা সুন্নত। *(ফতোয়া নাযিরিয়া ৩খন্ড ৪১৩, লেখক মিয়া নজীর হুসাইন দেহলবী)*

কাসেমী সাহেবের এ খেলাও জমেনি। কারণ, ইবনে মাসউদের হাদীসে সাক্ষাৎকালে মুসাফাহার কথা নেই। বরং তাতে হাত ধরে তালীম দেওয়ার কথা আছে। উলামাগণ বলেন,

وأما قول بن مسعود ﷺ : علمني النبي ﷺ وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، أخرجه الشيخان فليس من المصافحة في شيء بل هو من باب الأخذ باليد عند التعليم لمزيد الاعتناء والاهتمام به.

অর্থাৎ, ইবনে মাসউদ ﷺ-এর এই উক্তি, 'নবী ﷺ আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন, যেমন আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। আর আমার করতল তাঁর দুই করতলের মাঝে ছিল।' *(বুখারী-মুসলিম)*

এ উক্তি মুসাফাহার ব্যাপারে মোটেই নয়। বরং তা হল অধিক যত্ন ও আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষাদানের সময় (ছাত্রের) হাত ধরার পর্যায়ভুক্ত।

একই কথা বলেছেন লখনবী সাহেব এবং আরো অনেক হানাফী উলামাও। *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩২-৪৩৩)*

আহলে হাদীসের এক হাতে মুসাফাহার দলীল দেখুন 'অযাহাক্বাল বাতিল' বইয়ে।

কাসেমী সাহেব এক হাতের মুসাফাহাকে ইংরেজদের (?) হ্যান্ডশেক প্রথার অনুকরণ মনে ক'রেছেন। অথচ আহলে হাদীসদের মুসাফাহায় 'শেক' থাকে না।

বুখারী শরীফ	আহলে হাদীস
৭- হযরত আনাস রাঃ-কে জিন্নাসা করা হলে তিনি বলেন যে, বিতরের নামাযে দুয়া কুনুত রুকুর পূর্বে পড়তে হয়। *(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ১৩৬পৃঃ, ১০০২নং হাদীস: (বুখারী শরীফ ২ম খন্ড, ৫৮৬ পৃঃ, ৪০৮৮ নং হাদীস)*	দোয়া কুনুত রুকুর পরে হাত উঠিয়ে পড়া মুসতাহাব। *(ফতোয়া উলামায়ে হাদীস ৩ খন্ড ২০৬ পৃঃ আব্দুল হাসানাত আলী মুহাম্মাদ সাইদী)*

কুনুত দুই প্রকার ঃ নাযেলাহ, যা ফরয নামাযের শেষ রাকআতে রুকূর পরে পড়তে হয় এবং গায়র নাযেলাহ, যা বিতর নামাযের শেষ রাকআতে রুকূর আগে পড়তে হয়। এ জন্যই আহলে হাদীসের আমল দুই রকম হয়ে থাকে।

হুমাইদ বলেন, আমি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ফজরের কুনূত রুকূর আগে না পরে? উত্তরে তিনি বললেন, 'নবী ﷺ রুকূর আগে ও পরে কুনূত পড়েছেন।' *(ইবনে মাজাহ ১১৮৩, মিশকাত ১২৯৪নং)*

বুখারী শরীফ	আহলে হাদীস
৮-ফরয নামায শেষ দুই রাকাতে রসূলুল্লাহ সাঃ শুধুমাত্র সূরা ফাতেহা পড়েছেন। অন্য কোন সূরা মেলাননি। *(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ১০৭ পৃঃ, ৭৭৬ নং হাদীস)*	ফরয নামাযের শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা মেলনো জায়েয আছে। *(নুযুলুল আবরার ১ খন্ড ৭৮ পৃঃ, লেখক আল্লামা অহীদুযযামান সাহেব হায়দারাবাদী)*

হ্যাঁ, সেটাই সঠিক এবং সেটাই অন্য হাদীসের মত। কারণ বুখারীতেই আছে, আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক নামাযে ক্বিরাআত আছে ----। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি এর বেশী পড়বে, তা তার জন্য উত্তম হবে।' *(বুখারী ৭৭২, মুসলিম ৩৯৬ নং)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'পুরো নামাযেই ক্বিরাআত পড়া হয়---।' *(মুসলিম ৩৯৬ নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الظُّهْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً وَفِى الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ وَفِى الْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِى الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.

উক্ত হাদীসে সাহাবাগণ তাঁর যোহরের প্রথম দু' রাকআতে প্রায় ৩০ আয়াত মতো, শেষ দু' রাকআতে তার অর্ধেক প্রায় ১৫ আয়াত মতো, আসরের প্রথম দু' রাকআতে তার অর্ধেক প্রায় ৭/৮ আয়াত মতো এবং শেষ দু' রাকআতে তার অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৩/ ৪ আয়াত মতো পড়া আন্দাজ করতেন। *(মুসলিম ১০৪৩নং)*

এতে বুঝা যায় যে, আসরের শেষ দু' রাকআতেও অন্য সূরা (অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের) পড়া চলবে।

বুখারী শরীফ	আহলে হাদীস
৯- বুখারী ফরজ নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ে এবং আসরের ফরজ নামাযের পর সুর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে কোন (সুন্নত/নফল) নামায পড়তে রসূলল্লাহ সাঃ নিষেধ করেছেন। *(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ৮২ পৃঃ, ৫৮১ নং হাদীস)*	যদি জামাত শুরু হয়ে যায় তাহলে ফরয নামাযের পর সুন্নত পড়া যাবে। *(স্বলাতুর রাসূল ৩৫১ পৃঃ, লেখক হাকীম সাদিক সিয়ালকোটী)*

কাসেমী সাহেব সম্ভবতঃ ফজরের সুন্নত ও ফরয নামাযের কথা বলতে চেয়েছেন। তার মানে আসর ও ফজরের পরে কোন নামায নেই, কোন সুন্নত ও নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ। এ কথায় আহলে হাদীস বুখারীর বিরুদ্ধে নয়।

এ হাদীসের নিষেধের আওতায় সে ব্যক্তি পড়ে না, যে ফরয নামায পড়েনি। জামাআত হওয়ার পরেও তাকে ফরয পড়তে হবে এবং সূর্য ডোবা-ওঠার সময়েও সে নামায হয়ে যাবে। কারণ এ কথা বুখারীতেই আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ».

"যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এবং সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত নামায পেয়ে যায়, সে (যথাসময়ে) নামায পেয়ে যায়।" *(বুখারী ৫৭৯, মুসলিম ১৪০৮, মিশকাত ৬০১নং)*

অনুরূপ ফজরের ছুটে যাওয়া সুন্নত উক্ত নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। একদা এক ব্যক্তি মসজিদে এসে দেখল আল্লাহর নবী ﷺ ফজরের ফরয পড়ছেন। সে সুন্নত না পড়ে জামাআতে শামিল হয়ে গেল। অতঃপর জামাআত শেষে উঠে ফজরের ছুটে যাওয়া দুই রাকআত সুন্নত আদায় করল। মহানবী ﷺ তার কাছে এসে বললেন, "এটি আবার কোন্ নামায? (ফজরের নামায কি দুইবার?)" লোকটি বলল, 'ফজরের দুই রাকআত সুন্নত ছুটে গিয়েছিল।' এ কথা শুনে তিনি আর কিছুই বললেন না (চুপ থাকলেন)। *(আহমাদ ২৩৭৬০, আবূ দাউদ ১২৬৭, তিরমিযী ৪২২, ইবনে মাজাহ ১১৫৪নং)*

বিঃদ্রঃ 'হানাফী মজহাবের মাসআলা বুখারী শরীফের উপরোক্ত প্রতেকটি হাদীসনুযায়ী। পক্ষান্তরে আহলে হাদীসের মাসআলা বুখারী শরীফের হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত।'

উদার মনের অধিকারী সুপ্রিয় পাঠক! কাসেমী সাহেবের এ দাবী যে নেহাতই বিভ্রান্তিমূলক, তা আশা করি আপনার নিকট অস্পষ্ট নয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই রূপ বহু বিভ্রান্তি নেটেও ছড়ানো রয়েছে। যেহেতু দলের ভাঙ্গন রুখতে এরূপ করা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। 'নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে' মনোনিবেশ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

কিন্তু তাদের কত মাসআলা যে বুখারী শরীফের সম্পূর্ণ বিপরীত, আশা করি তাও কোন মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। জানতে থাকুন, আর উদার মন নিয়ে বিচার করুন। আপনার জ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত হোক। হিদায়াতের পথ হোক সহজ।